আমেরিকান গডস

আমেরিকান গডস

নিল গেইম্যান

রূপান্তরঃ মোঃ কুয়াদ আল কিদাহ

ADEE

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৬২৬২৮২৮২৭
প্রকাশকাল : আগস্ট, ২০১৭
©লেখক
প্রচ্ছদ : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অলংকরণ : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ৮০০ টাকা

American Gods by Neil Gaiman
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 800 Tk. U.S. :20 $ only

অনুপস্থিত বন্ধু-ক্যাথি অ্যাকার এবং রজার জিলেনি,
আর এই দুজনের মাঝে যারা যারা বিদায় নিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে।

আদী থেকে প্রকাশিত নিল গেইম্যানের অন্যান্য বই
নর্স মিথলজি
স্টোরিজ

আমার মনে প্রায়শই একটা প্রশ্ন জাগে-অভিবাসীরা যখন নতুন কোন দেশে আসে, তখন পেছনে ফেলে আসা পৌরাণিক চরিত্রদের কী হয়? আইরিশ-আমেরিকানরা সাথে করে নিয়ে এসেছিল কেয়ারিদের। নরওয়েজিয়ান-আমেরিকানদের সাথে এসেছে নিসার-রা। গ্রিক-আমেরিকানদের হাত ধরে এসেছে ক্রিকোলাকোস। যখন আমি জানতে চাইলাম, এসব প্রানিদের কেন আমেরিকায় দেখা যায় না, আমার তথ্যদাতা হাসতে হাসতে বলল, 'সম্ভবত, সমুদ্র পার হবার সাহস নেই বলে!' সেই সাথে মনে করিয়ে দিল, যীশু বা তার হাওয়ারিরাও কখনও আমেরিকায় পা রাখেননি।

-রিচার্ড ডরসন, আ থিওরি অফ আমেরিকান ফোকলোর।

লেখকের কথা

যে বইটা এখন আপনারা হাতে ধরে আছেন, সেটার সাথে আগে প্রকাশিত কপিগুলোর কিছুটা পার্থক্য আছে।

আমেরিকান গডস লিখতে দুই বছর সময় লেগেছিল আমার, ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। এই বইটাকে নিয়ে অনেক আশা ছিল, চেয়েছিলাম এমন একটা বই লিখতে যেটা আকারে বড়, অদ্ভুত আর যার গল্পটা সর্পিল। মনে হয়, পেরেছি কাজটা করতে। সময় লাগলেও, অবশেষে শেষ করতে সক্ষম হয়েছি বইটি। পাণ্ডুলিপি জমা দেবার সময় মাথায় একটা প্রবাদ খেলে যাচ্ছিল–উপন্যাস হলো এমন এক গদ্য, যাতে কোনো না কোনো সমস্যা আছে। সন্তুষ্ট হয়ে ভেবেছিলাম, ওরকম সমস্যা-ওয়ালা একটা উপন্যাস লিখে ফেলেছি! আমার সম্পাদক ভয় পাচ্ছিলেন, লেখাটা সম্ভবত একটু বেশিই বড় হয়ে গিয়েছে, প্যাঁচানোও হয়েছে বেশি (তবে আরেকটু অদ্ভুত হলেও সম্ভবত ভদ্রমহিলা আপত্তি করতেন না)। তিনি অনুরোধ করলেন, একটু যেন কাটছাঁট করি। তাই করেছিলাম। তিনি যে ঠিক ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই...বইটার সফলতাই তার প্রমাণ। অনেক কপি বিক্রি হয়েছে, অনেকগুলো পুরষ্কারও পেয়েছি। দ্য নেবুলা আর দ্য হুগো অ্যাওয়ার্ড (যেটা সাধারণত সায়েন্স ফিকশনকে দেয়া হয়), দ্য ব্রাম স্টোকার অ্যাওয়ার্ড (যেটা পায় হরর উপন্যাস), দ্য লোকাস অ্যাওয়ার্ড (ফ্যান্টাসির জন্য) যাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য। তাই বুঝতেই পারছেন, উপন্যাসটা অদ্ভুতই বটে। বইটি জনপ্রিয় হলেও, ঠিক কোন ঘরানায় পড়ে তা কেউ বুঝতে পারেনি। হয়তো সেজন্যই পছন্দ হয়েছে সবার।

এদের মাঝে আছেন পিট অ্যাটকিনস আর পিটার স্লাইডার, হিল হাউসের দুই পার্টনার। বইটির আমেরিকান প্রকাশকের সাথে কথা বলে, তারা লিমিটেড এডিশন ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন। আগ্রহ নিয়ে যখন আমাকে তারা তাদের পরিকল্পনা জানালেন, তখন খচখচ করতে শুরু করল মন।

সচরাচর পথের ভিন্ন একটা পথ ধরে জানতে চাইলাম, তারা কি আমার আসল পাণ্ডুলিপিটা ছাপাবেন?

উত্তরে হ্যাঁ জানালেন দুজন!

সমস্যা শুরু হলো তখনই। প্রথমবার কাটছাঁট করার পর, অনেক পরিবর্তন এসেছে বইটির নানা এডিশনে। তাই আমেরিকান গডসের সেরা পাণ্ডুলিপিটা দাঁড় করাতে হলে আমাকে কাটছাঁট না করা সর্বশেষ পাণ্ডুলিপির সাথে কাটছাঁট করা সর্বশেষ পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখতে হবে। তারপর আবার দেখতে হবে ছাপার অক্ষরে থাকা সর্বশেষ বইটি। অতঃপর সবমিলিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে আমাকে।

লম্বা পরিশ্রমের ব্যাপার। তাই এই পরিস্থিতিতে যেকোন বুঝবান লোক যা করত, আমিও তাই করলাম। কয়েকটা বড় বড় কম্পিউটার ফাইল এবং বইটির দুই কপি (আমেরিকান আর ব্রিটিশ, দুটোই) পাঠিয়ে দিলাম পিট অ্যাটকিনসের কাছে। অনুরোধ করলাম, সবকিছু যেন গুছিয়ে ফেলেন তিনি। মানতেই হয়, দারুণ কাজ করেছেন ভদ্রলোক। সর্বশেষ পাণ্ডুলিপি হাতে পাবার পর কাজে নেমে পড়লাম আমি। ভুলগুলো ঠিক করলাম, কোথাও আবার গুছিয়ে লিখলাম কিছু জিনিস। কিছু জায়গা বাদও পড়ল, তবে ওগুলো বইয়ের আকার কমাবার জন্য বাদ দেইনি। যাই হোক, সবশেষে যেটা পেলাম, সেটা নিয়ে আমি মোটামুটি সন্তুষ্ট। তবে লেখকের কাছে উপন্যাস মানেই হলো এমন এক গদ্য, যাতে কোন না কোন সমস্যা আছে!

হিল হাউস ছাপাল নতুন পাণ্ডুলিপি। দারুণ সেই লিমিটেড এডিশনে (যার দামটাও বেশ দারুণই ছিল) সাড়ে সাতশ কপি বইয়ের জায়গা হলো। ক্রেতা সবাইকে বিনামূল্যে একটা একটা করে 'পাঠকের কপি'ও দেয়া হলো সাথে, যেন লিমিটেড এডিশনের বইটা পড়তে গিয়ে তাতে দাগ না ফেলে দেন!

হেডলাইন যখন সিদ্ধান্ত নিল, আমার সবগুলো উপন্যাস নতুন করে আবার ছাপাবে, তখন জানতে চাইল কোন বইতে কিছু যোগ করতে চাই কিনা। আমেরিকান গডসের ক্ষেত্রে দেখা গেল, নতুন করে বইটা আমি পড়াতে চাইছি পাঠকদের! বইটির এই মুদ্রণে প্রায় বারো হাজার শব্দ বেশি আছে। অন্য মুদ্রণ পুরস্কার জিতেছে বটে, তবে এই মুদ্রণ নিয়ে আমি সর্বাধিক গর্বিত।

এই বর্ধিত উপন্যাস ছাপাবার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য হেডলাইনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সেই সাথে পাণ্ডুলিপি সাজানোয় সাহায্য করার জন্য পিট অ্যাটকিনসকেও জানাই ধন্যবাদ।

নিল গেইম্যান
সিঙ্গাপুরে যাবার পথে বিমানে, ৩ জুলাই, ২০০৫

পর্ব এক

প্রতিচ্ছায়া

অধ্যায় এক

আমাদের দেশের সীমানা জানতে চাইছেন, স্যার? উত্তরে রয়েছে অরোরা বোরিয়ালিস, পূবে উদীয়মান সূর্য। দক্ষিণে গেলেই পাবেন বিষুবরেখা, আর পশ্চিমে? পশ্চিমে আছে হিসেবের দিন।

-দ্য আমেরিকান জো মিলার'স জেস্ট বুক

জেলে তিন বছর হতে চলছে শ্যাডোর। গায়ে-গতরে যথেষ্ট বড় সে, আর ভাবে-ভঙ্গিমাতেও যথেষ্ট ভয় জাগানিয়া। তাই এখন ঝামেলা বলতে কেবল একটাই-একঘেয়েমি। অবশ্য তা থেকে বের হবার উপায় খুঁজে নিয়েছে ও, দেহকে সুন্দর রাখতে অনেকটা সময় ব্যয় করে; সেই সাথে শেখে পয়সা নিয়ে হাত সাফাইয়ের নানা কাজ। ওহ, আরও একটা কাজ করে: স্ত্রীকে কতটা ভালোবাসে, বসে বসে তাই ভাবে!

জেলের থাকার সবচেয়ে ভালো দিক...হয়তো একমাত্র ভালো দিকটা হলো এক ধরনের স্বস্তির মাঝে ডুবে থাকা। এই অনুভূতির জন্ম কিন্তু জেলের পরিবেশে নয়, অন্য কোথাও। কয়েদি হওয়া মানে–পদস্খলন হতে হতে জীবনের একেবারে শেষ ধাপে এসে উপস্থিত হওয়া। পাপ একদিন পাকড়াও করবে, এই ভয় আর নেই শ্যাডোর মনে। কেননা, পাপ পাকড়াও করেই ওকে জেলে পাঠিয়েছে। আগামীকাল আর কতটা নিচে নামতে হবে, সেই আতঙ্কে আর কাঁপে না ও। কেননা যতটুকু নিচে যাওয়া সম্ভব, গতকালই চলে গিয়েছে।

অপরাধ সত্যি না মিথ্যা, তাতে কয়েদির জেল-জীবনে কোন পরিবর্তন আসে না। অভিজ্ঞতা থেকে শ্যাডো জানে, সব কয়েদীরই ধারণা–তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। হয় কর্তৃপক্ষ কোন একটা ভুল করে তাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, অথবা কর্মপ্রণালীতে আছে গোলমাল! তবে জানা আছে শ্যাডোর, কর্তৃপক্ষ সম্ভবত সব সময় প্রকৃত অপরাধীকেই পাকড়াও করে।

প্রথম প্রথম বাজে স্বাদের খাবার আর গালি-গালাজ, সবকিছুই অপরিচিত বলে মনে হতো তার। কিন্তু ওই যে, স্বস্তির অনুভূতিটুকু...অতটুকুই ছিল শ্যাডোর অনেক বড় পাওয়া।

এমনিতে চুপচাপ থাকতেই ভালোবাসে ও। দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে, লো কী লেস্মিথ, ওর সেলের আরেক কয়েদীকে জানাল নিজের জেল–সংক্রান্ত তত্ত্বের কথা।

লো কী মিনেসোটার এক যাযাবর, ওর কথা শুনে মুখ বিকৃত করে হেসেছিল কেবল। 'হুম,' বলেছিল লোকটা। 'খুব একটা ভুল বলনি। মৃত্যুদণ্ড পেলে ব্যাপারটা আরও ভালো বোঝা যায়।'

'তাই? আচ্ছা, এই রাজ্যে শেষ কবে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল?' জানতে চেয়েছিল শ্যাডো।

'আমি কী জানি?' লেস্মিথের কমলা-সোনালী চুল কখনও বড় হতে দেখেনি শ্যাডো। 'তবে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। যখন এই দেশে মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলান হতো, তখন জায়গাটা ছিল একটা নরক!'

শ্রাগ করেছিল শ্যাডো। মৃত্যুদণ্ড নিয়ে মাতামাতি করার তেমন কোন কারণ দেখে না সে।

তবে মৃত্যুদণ্ড–প্রাপ্ত না হলে, একজন কয়েদীর জেল জীবন খুব একটা খারাপ না। একেঘেয়ে দৈনন্দিন জীবন থেকে খানিকটা বিরতি বললেও অত্যুক্তি হবে না। শ্যাডোর এই ধারণাটার পেছনে কারণও আছে। প্রথম কারণ–জীবন থেমে থাকে না, কেটে যায়। রাজ-প্রাসাদে হলেও কাটে, কাটে জেলের ঘুপচিতেও। আর দুই, দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থাকতে পারলে, একদিন না একদিন কয়েদ থেকে মুক্তি মিলবেই।

প্রথম প্রথম মুক্তির দিনটা এতদূরে ছিল যে শ্যাডো ওটা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করত না। আস্তে আস্তে সেই দিন কাছে আসতে শুরু করল। জেলের জীবন খুব একটা নিস্তরঙ্গ নয়, তাই ঝামেলা হলে নিজেকে বোঝাত–আর বেশি দিন নেই। একদিন ওই জাদুর দরজা খুলে শ্যাডো ফিরে যাবে আগের দুনিয়ায়। তাই দিন-পঞ্জিকায় হিসাব রাখতে শুরু করল ও। ওখানকার গ্রন্থাগার থেকে অনেক খুঁজে পাওয়া একটা বই পড়ে পড়ে শিখতে শুরু করল হাত সাফাইয়ের খেলা, পুরোটাই পয়সা নিয়ে। সেই সাথে ব্যায়াম করে নিজের স্বাস্থ্য আরও পেটা বানাবার কাজটা তো আছেই। রাতের সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখত জেল থেকে বেরোবার পর কী করবে, সেই তালিকা বানানোয়।

দিন যাচ্ছে, আর আস্তে আস্তে ছোট হতে শুরু করেছে শ্যাডোর তালিকা। বছর দুই পরে দেখা গেল, ওতে মাত্র তিনটা কাজ স্থান পেয়েছে।

প্রথম, লম্বা সময় ধরে একটা গোসল করা। পারলে কোন বাথটাবে, সাবানের ফেনার মাঝে নাক ডুবিয়ে। সেসময় ইচ্ছা করলে হয়তো খবরের কাগজ পড়বে, ইচ্ছা না হলে পড়বে না।

দ্বিতীয়ত, একটা তোয়ালে নিয়ে নিজেকে মোছা। এরপর আরামদায়ক রোব গায়ে গলাবে। মাঝে মাঝে চপ্পল পায়ে দিতে ইচ্ছা হয়, আবার মাঝে মাঝে হয় না। ধূমপান করে না বলে পাইপ টানার চিন্তা বাদ দিয়েছে। স্ত্রীকে কোলে তুলে নেবে শ্যাডো, ভয় পেয়ে ওর স্ত্রী চিৎকার করে উঠবে, 'পাপি! কী করছ!'। কিন্তু ছাড়বে না শ্যাডো। শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে। খিদে যখন অসহনীয় হয়ে যাবে, তখন নাহয় পিজ্জার অর্ডার দেয়া যাবে।

তালিকায় থাকা সর্বশেষ কাজটার কথায় আসা যায়। কয়েকদিন পর যখন ওরা ঘর থেকে বের হবে, তখন মাথা নিচু করে চুপচাপ বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কোনদিন কোন ঝামেলায় জড়াবে না।

'এতে সুখী হবে?' লো কী লেস্মিথ জানতে চেয়েছিল একদিন। সেদিন ওরা কাজ করছিল জেলের দোকানে, পাখিদের খাবার ভরছিল বস্তায়।

'মানুষ কেবল তখনই সুখী হয়,' উত্তর দিয়েছিল শ্যাডো। 'যখন সে মাটির নিচে থাকে।'

'হেরোডোটাসের বাণী।' বলেছিল লো কী। 'কিছু শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে দেখি!'

'এই হেরোডোটাস হারামিটা কে?' ওদের সাথে কর্মরত আইসম্যান জানতে চাইল।

'অনেক আগে মারা যাওয়া এক গ্রিক।' শ্যাডোর জবাব।

'আমার সর্বশেষ প্রেমিকাও গ্রিক ছিল।' বলেছিল আইসম্যান। 'ওরা যে কী বাল-ছাল খায়! তোমরা বিশ্বাসই করবে না।'

আইসম্যান লোকটা আকারে মোটামুটি একটা কোকের মেশিনের সমান, নীল চোখ আর প্রায় সাদা, সোনালী চুল। ওর প্রেমিকা এক বারে নাচত। সেই বারেই বাউন্সার ছিল লোকটা। আরেক অভদ্র প্রেমিকার গায়ে হাত দিয়েছিল বলে আরেকটু হলে তাকে পিটিয়েই মেরে ফেলত আইসম্যান! ফলাফল–পুলিশের আগমন। অনুসন্ধানে বের হলো, আইসম্যান মাত্র আঠারো মাস আগে জেল থেকে বের হয়েছে! কর্মের বিনিময়ে মুক্তি নামক চুক্তির আওতায় ছাড়া হয়েছিল ওকে।

'আমার আর কী করার ছিল, বলো?' আইসম্যান একদিন খেতে খেতে বলেছিল শ্যাডোকে। 'লোকটাকে বললাম, মেয়েটা আমার বান্ধবী। তারপরও হাত দিল সে! অপমান কাকে বলে! আমার কী তাকে ছেঁড়ে দেয়া উচিত ছিল?'

মাথা ঠান্ডা রাখো, দণ্ডটা পার করলেই মুক্তি। শ্যাডো তাই বলেছিল,'তাই তো।' ব্যাস, আর কোন কথা হয়নি এ প্রসঙ্গে। একটা জিনিস আগেই শিখে গিয়েছিল শ্যাডো, জেলে যার যার দণ্ড তাকেই খাটতে হয়। তার হয়ে অন্য কেউ খেটে দেয় না।

কয়েক মাস আগে শ্যাডোকে এক কপি জীর্ণ বই দিয়েছিল লেস্মিথ- হেরোডোটাসের ইতিহাস। 'বিরক্তিকর কিছু না, মজাই পাবে।' শ্যাডো নিতে অস্বীকার করায় বলেছিল। 'একবার পড়েই দেখ।'

বিরক্ত হয়েই শুরু করেছিল শ্যাডো। কিন্তু আর নামিয়ে রাখতে পারেনি।

একদিন আচমকা ট্রান্সফার হয়ে গেল লেস্মিথ! শ্যাডোর জন্য রেখে গেল হেরোডোটাসের বইটা। পাতার মাঝে একটা নিকেলও ছিল। জেলখানায় পয়সা নিষিদ্ধ, পাথর ব্যবহার করে ওটাকে ধারালো করে তোলা যায় বলে। এরপর কারও সাথে হাতাহাতি হলে তার চেহারায় চিরস্থায়ী একটা ক্ষত করে দেয়াটা একদম সহজ! তবে শ্যাডোর কোন অস্ত্রের দরকার নেই। দরকার এমন কিছু, যা ব্যবহার করে নিজের হাতজোড়াকে ব্যস্ত রাখতে পারে।

কুসংস্কার নেই ওর মাঝে। যা দেখে না, তার উপর বিশ্বাসও নেই। তারপরও মুক্তির দিন ঘনিয়ে আসতে ধরলে কেমন যেন এক অশুভ ভয় চেপে বসল ওর উপর। যে ডাকাতিটা করে ধরা খেয়েছে, সেটার আগেও হয়েছিল এই অনুভূতি। পেটের ভেতরটা যেন খামচে ধরেছিল কেউ একজন। এটাকে পুরনো জীবনে ফিরে যাবার আতঙ্ক বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল ও। কিন্তু নিশ্চিত না নিজেই। রশিতে সর্প দেখছে যেন। এমনিতে কয়েদিদের কাছে এই স্বভাবটা গুণ আর বেঁচে থাকার এক অমূল্য উপায় হিসেবেই সমাদরপায়।

আগের চাইতেও চুপ হয়ে গেল শ্যাডো। লক্ষ্য করে দেখল, নিজের অজান্তেই গার্ডদের দেহ-ভঙ্গির উপর নজর রাখছে সে। খেয়াল করছে অন্যান্য কয়েদীদেরও। বাজে একটা কিছু হতে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাই সেই বাজে ব্যাপারটার স্বরূপ জানার জন্য সূত্র খুঁজছে এসবের মাঝে।

মুক্তির দিনটার ঠিক এক মাস আগের কথা। শ্যাডো বসে আছে একটা ঠান্ডা অফিস ঘরে, সামনে ছোট-খাটো এক ভদ্রলোক। ডেস্কের এ পাশে ও, আর ওই পাশে অন্য ভদ্রলোকটা। লোকটার হাতে একটা বলপয়েন্ট কলম, ভোঁতা দিকটা চিবানো।

'ঠান্ডা লাগছে, শ্যাডো?'

'তা একটু লাগছে বটে।'

শ্রাগ করলেন লোকটা। 'নিয়ম।' বললেন তিনি, 'ডিসেম্বরের এক তারিখের আগে ফার্নেস জ্বালানো নিষেধ। আবার বন্ধ করতে হবে মার্চের এক তারিখেই। কী আর করা, আমি তো আর নিয়ম বানাই না।' বলতে বলতেই লোকটা হাতে ধরা কাগজের ফোল্ডারে আঙুল বোলালেন। 'তোমার বয়স বত্রিশ হলো?'

'জি, স্যার।'

'দেখে তো মনে হয় না।'

'বাজে অভ্যাস নেই যে।'

'এখানে লেখা, জেলে থাকা অবস্থায় তুমি কোন ঝামেলায় জড়াওনি।'

'আমার শিক্ষা হয়েছে, স্যার।'

'তাই নাকি?' মন দিয়ে শ্যাডোর দিকে তাকালেন তিনি। একবার সে ভাবল, ভদ্রলোককে সব কথা বলেই দেয়। কিন্তু চুপ করে রইল, মাথা ঝাঁকাল কেবল।

'তুমি বিবাহিত, শ্যাডো?'

'হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর নাম লরা।'

'ওদিকে কোন সমস্যা নেই তো?'

'না, স্যার। অনেকদূর থেকে আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসে মেয়েটা। চিঠিও আদান-প্রদান করি আমরা, সম্ভব হলে দুই-একটা ফোনও।'

'কী করে তোমার স্ত্রী?'

'ও ট্রাভেল এজেন্ট, স্যার।'

'দেখা হলো কীভাবে?'

লোকটার এই আকস্মিক প্রশ্নের কারণ বুঝতে পারল না শ্যাডো। একবার ভাবল, মুখের উপর বলে দেয় যেন তিনি এতে নাক না গলান। কিন্তু তা না বলে বলল, 'আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর স্ত্রীর সবচেয়ে কাছের বান্ধবী ও। ওদের মাধ্যমেই পরিচয়।'

'এখান থেকে বেরোবার পর কাজ পাবে?'

'জি, স্যার। আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু রবি, ওর একটা ব্যায়ামাগার আছে। আমি ওখানেই কাজ করতাম। ও বলেছে, চাইলে আমি আবার কাজে যোগ দিতে পারি।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল লোকটার, 'তাই?'

'রবি বলছে, আমি গেলে নাকি পুরনো গ্রাহকরা ফিরে আসবে!'

ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট বলে মনে হলো। বল পয়েন্ট কলমটা কামড়ে ধরে উল্টালেন একদম শেষ পাতাটা। 'যে অপরাধ করেছ, সেটার ব্যাপারে এখন তোমার কী মত?'

কাঁধ ঝাঁকাল শ্যাডো। 'আমি বোকার মতো কাজ করেছি।' মন থেকেই বলল সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা তালিকার কিছু লাইনে টিক দিলেন লোকটা। এরপর কাগজ উল্টিয়ে বললেন, 'বাড়িতে যাবে কী করে?'

'বিমানে, স্যার। স্ত্রী ট্রাভেল এজেন্ট হবার কিছু বাড়তি সুবিধা আছে।'

আবার ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন লোকটা। 'টিকেট পাঠিয়েছে?'

'দরকার হয়নি। নিশ্চিত করার জন্য একটা নাম্বার দিয়েছে-ইলেকট্রনিক টিকেটের নাম্বার। এক মাস পর বিমান বন্দরে গিয়ে আমার পরিচয়পত্রটা দেখালেই হবে।'

নড করল লোকটা, শেষবারের মতো কিছু একটা লিখে নিয়ে নামিয়ে রাখলেন কলম। সাদাটে দুটো হাত নেমে এলো একটা ধূসর ডেস্কে। হাত দুটো একটি আরেকটার মাঝে ঢুকিয়ে স্পর্শ করলেন কপাল। এরপর হালকা বাদামী রঙের চোখজোড়া দিয়ে একদৃষ্টিতে শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি সৌভাগ্যবান। তোমার ফেরার অপেক্ষায় কেউ না কেউ বসে আছে। আরেকটা সুযোগ এসেছে তোমার সামনে। এর সদ্ব্যবহার করো।'

শ্যাডোকে বিদায় দেবার সময় দাঁড়ালেন না তিনি, করমর্দনের জন্য বাড়িয়ে দিলেন না হাতটাও। অবশ্য শ্যাডো ওসব আশাও করেনি।

গত সপ্তাহটা একদম বাজে গিয়েছে। এক হিসেবে সারাটা বছরও এতটা বাজে যায়নি। আবহাওয়া তার একটা কারণ হতে পারে– ঠান্ডা পরিবেশ যে কাউকে হতাশ করে তুলবে। মনে হচ্ছিল যেন ঝড় আসছে! কিন্তু না, আসেনি এখনো। কেমন একটা অদ্ভুত বোধ হচ্ছে ওর।

স্ত্রীকে ফোন দিল ও, বিলটা লরাই দেবে। শ্যাডো জানে, ফোন কোম্পানিরা জেলখানা থেকে করা প্রতিটা ফোনের বিলের সাথে তিন ডলার যোগ করে দেয়। এজন্যই তাদের ব্যবহার এত ভদ্র।

'কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে সব,' লরাকে জানাল সে। তবে একদম প্রথমেই না। প্রথম কথাটা ছিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' স্ত্রীর সাথে যে কোন বাক্য-বিনিময়ের শুরুতে এর চাইতে দারুণ আর কিছু হয় না! আর যদি সেগুলো অন্তর থেকে আসে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

শ্যাডো অন্তর থেকেই বলেছিল কথাগুলো।

'হ্যালো,' বলল লরা। 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু কী অদ্ভুত ঠেকছে?'

'জানি না,' বলল শ্যাডো। 'হয়তো আবহাওয়াটাই অদ্ভুত। আমার ধারণা, ঝড় হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'এখানের আবহাওয়া কিন্তু ভালো।' জানাল মেয়েটা। 'গাছের সব পাতা এখনো ঝরে পড়েনি। ঝড়-টড় না হলে, বাড়িতে এসে তুমিও দেখতে পাবে।'

'আর তো পাঁচ দিন।'

'হ্যাঁ, একশ বিশ ঘণ্টা।'

'তোমার কী অবস্থা, সব ঠিক আছে?'

'সব ঠিকই আছে।' জানাল লরা। 'আজ রাতে রবির সাথে দেখা হবে। তোমার ফিরে আসা উপলক্ষে আমরা একটা সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করেছি।'

'সারপ্রাইজ পার্টি?'

'অবশ্যই। তুমি কিন্তু ওটার ব্যাপারে কিছু জানো না, বুঝলে তো?'

'বুঝলাম, কিচ্ছু জানি না!'

'এই না হলে আমার স্বামী।' বলল লরা। শ্যাডো বুঝতে পারল, হাসি ফুটেছে ওর মুখে। তিন বছর হয়ে গেল, এখনো ওকে হাসাতে পারে মেয়েটা।

'ভালোবাসি তোমায়।'

'আর আমি তোমায়, পাপি।' ফোন রাখল লরা।

বিয়ের পরপরই লরা বলেছিল শ্যাডোকে, ছোট আকারের একটা বাচ্চা কুকুর বা পাপি ওর চাই-ই চাই। কিন্তু বাড়িওয়ালা দিয়ে বসল বাগড়া। চুক্তিপত্র বের করে দেখাল, পশু পালনের অনুমতি তাদের নেই। 'বাদ দাও,' বলেছিল সেদিন শ্যাডো। 'আমি তোমার পাপি হবো! বলো, কী করলে খুশি হও? তোমার চপ্পলগুলো চিবাবো? ভিজিয়ে দেব রান্নাঘরের দরজা? নাকি নাকটা একটু চেটে দেব? বাজি ধরে বলতে পারি, কোন আসল পাপি যা যা করতে পারবে, তোমার এই নকল পাপিও তাই তাই পারবে!' কোলে তুলে নিয়েছিল সেদিন স্ত্রীকে। নাক আর কানে স্পর্শ করেছিল জিহ্বা, দুষ্টুমি শেষ হয়েছিল বিছানায় গিয়ে।

খাবারের সময় শ্যাডোকে দেখে হাসল স্যাম ফেটিসার। ওর পাশে বসে খেতে শুরু করল ম্যাকারনি আর পনির। 'কথা বলা দরকার আমাদের।' স্যাম ফেটিসার বলল।

লোকটা সম্ভবত শ্যাডোর দেখা সবচেয়ে কালো মানুষ! বয়স ষাট হলেও হতে পারে, আশি হলেও হতে পারে! তবে এমন অনেক ত্রিশ বছর বয়সী মাদকাসক্তকেও দেখেছে শ্যাডো, যাদের বয়স স্যামের চাইতে বেশি বলে ভ্রম হয়।

'উম?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'ঝড় আসছে।'

'তাই তো মনে হয়, তুষারপাত হতে পারে।'

'উহু, ওই ঝড়ের কথা বলছি না। যখন আসল ঝড়টা আসবে, তখন এখানে না থেকে রাস্তায় থাকলেই ভালো করবে।'

'আমার সময় শেষ,' বলল শ্যাডো। 'শুক্রবারে ভাগছি।'

শ্যাডোর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল স্যাম ফেটিসার। 'তুমি কোথাকার লোক?'

'ইণ্ডিয়ানার, ঈগল পয়েন্টে বাড়ি।'

'হায়রে মিথ্যাবাদী,' বলল স্যাম। 'আদি বাড়ি কই?'

'শিকাগো।' শ্যাডোর মা কমবয়সে শিকাগোতে থাকতেন। অনেক আগেই মারা গিয়েছেন।

'যা বলছিলাম, বিশাল এক ঝড় আসছে। মাথা নত করে রাখো, বাছা। ঝড়টা মনে করো...আচ্ছা, ওই যে মহাদেশগুলো যে জিনিসটার উপর বসে আছে, ওটার নাম যেন কী?'

'টেকটনিক প্লেট?' আন্দাজে বলল শ্যাডো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটাই। উত্তর আমেরিকার প্লেট যদি দক্ষিণ আমেরিকার উপর চড়ে বসে, তাহলে অবস্থা কী হবে? এই ঝড়টাও তেমনই। বুঝতে পারছ?'

'একদম না।'

ছোট টিপ দিল যেন বাদামী একটা চোখ। 'সাবধান করিনি, পরে আবার এ কথা বলো না।' কমলা জেল-ও নামক জেলি ভর্তি একটা চামচ মুখে দিল স্যাম ফেটিসার।

'বলব না।'

রাতটা আধো-ঘুম, আধো-জাগরণে কেটে গেল শ্যাডোর। নতুন সেলমেট নিচের বাঙ্কে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। কয়েক সেল দূরের এক লোক গুঙিয়ে উঠছে থেকে থেকে, মনে হচ্ছে যেন ও কোন মানুষ নয়, পশু! অন্য কোন সেলের কয়েদী ধমকে উঠছে মাঝে-মধ্যে, চুপ করতে বলছে বেচারাকে। আওয়াজটা না শোনার চেষ্টা করল শ্যাডো, সময়ের হাতে ছেড়ে দিল নিজেকে।

আর মাত্র দুই দিন...আটচল্লিশ ঘণ্টা। নাস্তা খেতে বসেছে ও, মুখে ওটমিল আর হাতে কারাগারের কফি। এমন সময় কারারক্ষী উইলসন এসে প্রয়োজনের চাইতে জোরে চাপড় বসাল শ্যাডোর কাঁধে। 'শ্যাডো, আমার সাথে এসো।'

আচমকা এই ডাকার কারণ কী হতে পারে?নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করল শ্যাডো। চুপ করে রয়েছে বিবেক, মনে হয় না কোন গোলমাল করেছে ও। তবে কারাগারে এই নিস্তব্ধতার কোন অর্থ নেই। হয়তো বড় কোন বিপদে জড়িয়ে পড়তে চলছে। পুরাতন কফির ন্যায় তিক্ত একটা স্বাদ পেল গলা জুড়ে।

খারাপ কিছু একটা আসন্ন...

মস্তিষ্কের ভেতরে বাস করা কণ্ঠটা বলে চলছে, সম্ভবত আরেক বছর বাড়ানো হচ্ছে ওর শাস্তি। তার তা না হলে ওকে সলিটারিতে পাঠানো হচ্ছে। কে জানে, হয়তো হাত-মাথা কেটে ফেলার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্যাডোকে। নিজেকে ধমক দিল যুবক, বোকামি করছে যে তা বুঝতে পারছে। কিন্তু হৃদপিণ্ড কি আর মানে? পাগলা ঘোড়ার বেগে ছুটছে বেচারা।

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, শ্যাডো।' হাঁটতে হাঁটতে বলল উইলসন।

'কী বুঝতে পারেন না, স্যার?'

'তোমাকে। তুমি কেন যেন একটু বেশিই চুপচাপ, একটু বেশিই শান্ত। বয়স কত তোমার? পঁচিশ? আটাশ? অথচ চলাফেরায় বুড়োদেরকেও হার মানাও!'

'বত্রিশ, স্যার।'

'তুমি আসলে কী বলো তো? জিপসি? নাকি স্পিক?'

'তা আমার জানা নেই, স্যার। হতে পারি।'

'নাকি নিগ্রোদের রক্তের?'

'তা-ও হতে পারে, স্যার।' সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে শ্যাডো, লোকটার কথায় যে রেগে উঠছে তা বুঝতে দিতে চায় না।

'যাই হোক, তোমাকে দেখলেই আমার অস্বস্তি হয়।' উইলসনের মাথার চুল সোনালী, চেহারাতেও তেমন একটা ছাপ। 'জলদিই মুক্তি পাচ্ছ শুনলাম?'

'আমার তাই আশা, স্যার।'

বেশ কয়েকটা চেকপয়েন্ট পড়ল পথে, প্রত্যেকবার নিজের আইডি দেখাতে হলো উইলসনকে। একটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা মাত্র দেখা গেল, ওয়ার্ডেনের অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। জি. প্যাটারসন, ওয়ার্ডেনের নাম, কালো অক্ষরে খোদাই করা দরজায়। দরজার পাশেই ঝুলছে একটা ছোট ট্রাফিক লাইট।

এই মুহূর্তে লাল বাতি জ্বলে রয়েছে ওটায়।

ট্রাফিক লাইটের নিচে অবস্থিত একটা বোতাম চাপল উইলসন।

কয়েক মিনিট চুপচাপ ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল দুজন। শ্যাডো নিজেকে শান্ত রাখার প্রয়াস পেল। বারবার বলল, সব কিছু ঠিক আছে। শুক্রবার সকালে ও ঈগল পয়েন্টগামী বিমানে উঠে বসবে। কিন্তু কেন জানি নিজেকেই বিশ্বাস হলো না।

লাল বাতি বন্ধ হয়ে জ্বলে উঠল সবুজ বাতি, দরজা খুলে ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল উইলসন।

গত তিন বছরে হাতে গোণা কয়েকবার ওয়ার্ডেনকে দেখেছে শ্যাডো। একবার ভদ্রলোক এক রাজনীতিবিদকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন সব কিছু। আরেকবার লকডাউনের সময় সবাইকে এক করেবলেছিলেন, কারাগারে কয়েদীর সংখ্যা ধারণ ক্ষমতার চাইতে অনেক বেশি। আর যেহেতু নিকট ভবিষ্যতে অপরাধ বা কয়েদীর সংখ্যা কমার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, তাই আবাসনের এই অবস্থা মেনে নিলেই ওরা ভালো করবে।

কাছ থেকে কেমন যেন অসুস্থ দেখায় প্যাটারসনকে। মুখটা গোলাকার, চুলগুলো সামরিক কায়দায় ছোট ছোট করে কাটা। গা থেকে ওল্ড স্পাইস স্প্রের গন্ধ আসছে। ভদ্রলোকের পেছনে সারি বাঁধা বই। সবগুলোর নামে 'কারাগার' শব্দটা লেখা আছে। ডেস্কটা নিখুঁতভাবে পরিষ্কার রাখা। কেবল একটা টেলিফোন আর ক্যালেণ্ডার দেখতে পেল শ্যাডো। ডান কানে ঝুলছে একটা হেয়ারিং এইড, কানে কম শোনেন ওয়ার্ডেন!

'দয়া করে বসো।'

বসল শ্যাডো, উইলসন ওর পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

ডেস্কের ড্রয়ারগুলো একটা ফাইল বের করে আনলেন ওয়ার্ডেন, রাখলেন নিজের সামনে। 'মারামারি আর ডাকাতির দায়ে তোমাকে ছয় বছরের জেল

দেয়া হয়েছিল। তার মাঝে তিন বছর কয়েদ খেটেছ। শুক্রবারে তোমার ছাড়া পাবার কথা ছিল।'

কথা ছিল?

শ্যাডোর মনে হলো, কেউ যেন ওর পেট খামচে ধরেছে। আরও কয় বছর কারাগারে থাকতে হবে কে জানে! এক বছর? নাকি দুই বছর? তিন বছরই না তো? কিন্তু মুখ দিয়ে কেবল বলল, 'জি, স্যার।'

জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট চাটলেন ওয়ার্ডেন। 'কী বললে?'

'বললাম–জি, স্যার।'

'শ্যাডো, আমরা তোমাকে আজ বিকালেই ছেড়ে দিচ্ছি।' নড করল শ্যাডো, নিজের সৌভাগ্য নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। ওয়ার্ডেন তার ডেস্কে রাখা ফাইলটার দিকে তাকালেন। একটা কাগজ বের করে বললেন, 'এই কাগজটা ঈগল পয়েন্টের জনসন মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে এসেছে। তোমার স্ত্রী...আজ সকালে মারা গিয়েছে। গাড়ি দুর্ঘটনায়। আমি দুঃখিত।'

আবারও কেবল নড করল শ্যাডো।

উইলসনের প্রহরায় সেলে ফিরে এলো শ্যাডো, পুরো সময়টায় একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। প্রহরী দরজা খুলে দিলে ভেতরে প্রবেশ করল সে। আচমকা উইলসন বলে উঠল, 'সুসংবাদ-দুঃসংবাদ একসাথে পেলে, তাই না? আগে আগে ছাড়া পাচ্ছ, এটা সুসংবাদ। আবার স্ত্রী মারা গিয়েছে, এটাকে দুঃসংবাদ না বলে উপায় নেই।' হাসতে শুরু করল লোকটা, যেন এর চাইতে মজার কিছু আর হয় না।

তবুও কিছু বলল না শ্যাডো।

ধীরে সুস্থে নিজের সবকিছু গুছিয়ে নিল যুবক, অবশ্য প্রায় সবই দান করে দিয়েছে। লো কী'র হেরোডোটাস আর হাত সাফাইয়ের বইটাও নিল না। বিবেকের তাড়নায় রেখে গেল ছোট ধাতব একটা চাকতিও, পয়সার জায়গায় ওটা নিয়েই অনুশীলন করত শ্যাডো। বাইরের দুনিয়ায় অবশ্য আসল পয়সার অভাব হবে না কোন। দাড়ি কামিয়ে নিয়ে তিন বছরের মাঝে এই প্রথম গায়ে চড়াল স্বাভাবিক পোশাক। অনেকগুলো দরজা পার হয়ে যেতে হলো ওকে, জানে–আর কখনও ফিরে আসবে না।

হাড় কাঁপানো ঠান্ডা বৃষ্টি ঝরতে শুরু করেছে আসমান থেকে। শ্যাডোর চেহারায় হুল ফুটিয়ে যাচ্ছে যেন, ওর ওভারকোটও রক্ষা পায়নি–ভিজে একশা। আস্তে আস্তে প্রাক্তন স্কুল বাসটার দিকে এগিয়ে গেল ও, কাছের শহর পর্যন্ত ওটাতে করেই যেতে হবে।

আজ মোট আটজন মুক্তি পাচ্ছে জেল থেকে, আটজনই পুরোপুরি ভিজে গিয়েছে বৃষ্টিতে; পেছনে রেখে যাচ্ছে আরও পনের শো কয়েদীকে। হিটার চালু হতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। এই কিছুক্ষণ বাসের সিটে বসে কাঁপতে হলো ওদের। শ্যাডোর অবশ্য সেদিকে মন নেই। কী করছে, কোথায় যাবে–এসব নিয়েই ভাবছে।

অপ্রাকৃত কিছু দৃশ্য এসে ভরিয়ে তুলল ওর মন। কল্পনার সেই দৃশ্যতে দেখল–শ্যাডো এখনও কয়েদী! তবে অন্য কোন জেলে...অন্য কোন সময়ে।

সেই জেলে দীর্ঘদিন ধরে অন্ধকারে কয়েদ করে রাখা হয়েছে তাকে। চুল-দাড়িতে বন্য পশুর মতো দেখাচ্ছে ওকে। প্রহরীরা ওকে একটা ধূসর সিঁড়ি দিয়ে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এলো। মানুষ আর জিনিস-পত্রে ভর্তি জায়গাটা। হাটের দিন সেদিন, অনেকদিন পর আচমকা এত শব্দ আর রঙের মাঝখানে উপস্থিত হওয়ায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল বেচারা। তবে কিছুক্ষণের জন্য কেবল, এরপর বুক ভরে নিতে শুরু করল লবণাক্ত বাতাস। চোখ ভরে দেখতে শুরু করল চারপাশের দৃশ্য। ওর বাঁ হাতের দিকে একটা জলাধার দেখা যাচ্ছে, ওটার পানিতে ফুটে আছে সূর্যের প্রতিবিম্ব...

আচমকা থমকে দাঁড়াল বাসটা, সামনের সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলছে।

বাতাস চিৎকার করছে বাসটাকে ঘিরে,ওয়াইপারগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করেও উইণ্ডশীল্ডটাকে পরিষ্কার রাখতে পারছে না। বিকাল শুরু হয়েছে কেবল, কিন্তু কাঁচের ফাঁকে মনে হচ্ছে যেন রাত নেমেছে।

'এই,' শ্যাডোর পেছনে বসা এক লোক আচমকা কাঁচ ঘষতে ঘষতে বলল, 'মেয়েমানুষ দেখা যায়!'

ঢোক গিলল শ্যাডো। বুঝতে পারল, এখন পর্যন্ত একফোঁটা অশ্রু বেরোয়নি ওর চোখ দিয়ে। আসলে, এখন পর্যন্ত কোন অনুভূতিই খেলা করেনি ওর মনে। না দুঃখ, না অনুতাপ। কিচ্ছু না।

খেয়াল করল, অবচেতন মনে জনি লার্চ নামক এক কয়েদির কথা ভাবছে ও। লোকটা ছিল ওর প্রথম সেলমেট। একদিন সে অদ্ভুত এক গল্প শুনিয়েছিল শ্যাডোকে। বলেছিল, পাঁচ বছর জেল খাটার পর, একশ ডলার আর সিয়াটলের একটা টিকিট হাতে নিয়ে ছাড়া পেয়েছিল সে। ওর বোন থাকত সিয়াটলে। তাই সরাসরি বিমান বন্দরে গিয়ে কাউন্টারে বসা মেয়েটার হাতে টিকিট দিয়েছিল জনি। বিনিময়ে মেয়েটা চেয়েছিল ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে।

জিনিসটা সাথেই ছিল জনির, বের করে দেখাল। কিন্তু মেয়েটা জানাল, কয়েক বছর আগে মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় ওটা এখন আর কার্যকর নেই! জনি

উত্তরে বলল, 'মেয়াদোত্তীর্ণ হতে পারে, তবে পরিচয়পত্র হিসেবে তো যথেষ্ট, তাই না?'

আচমকা বলে উঠেছিল মেয়েটা, 'উঁচু গলায় কথা না বলার জন্য ধন্যবাদ।'

খেপে গেল জনি, জানাল-ভালোয় ভালোয় বোর্ডিং পাস না দিলে বেচারি পরে আফসোস করবে।

হঠাত দেখে, বিমান বন্দরের রক্ষীবাহিনি চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ধরেছে! মেয়েটা যে কখন তাদের ডেকেছে, তা টেরই পায়নি বেচারা। জনি লার্চকে চুপচাপ বিমান বন্দর ছাড়ার পরামর্শ দিল তারা। কিন্তু সে কি আর মানে? এরপর যা হবার তাই হলো, শুরু হলো হাতাহাতি।

জনি লার্চের আর সিয়াটলে যাওয়া হয়নি। পরবর্তী কয়েকটা দিন বারে বারে মদ খেয়ে কাটিয়ে দিল সে। একশ ডলার ফুরিয়ে যেতে খেলনা একটা বন্দুক নিয়ে চলে গেল এক গ্যাস স্টেশনে ডাকাতি করতে। পুলিশ যখন ওকে ধরে, তখন বেচারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পেশাব করছে। অচিরেই জেলে ফিরে এলো সে।

এই গল্পের শিক্ষা হলো, অন্তত জনি লার্চের মতে–বিমান বন্দরে যারা কাজ করে, তাদের সাথে পাঙ্গা নিতে যেও না।

স্মৃতিটা মনে পড়ে যেতেই হাসি ফুটে উঠল শ্যাডোর মুখে। ওর নিজের লাইসেন্সের মেয়াদ এখনও বেশ কয়েক মাস আছে।

'বাস স্টেশন! যাত্রীরা নামুন!'

প্রস্রাব আর বিয়ারের গন্ধে ভুরভুর করছে দালানটা। একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বিমানবন্দরের দিকে যেতে বলল ও ড্রাইভারকে। সেই সাথে কথা না বলার পুরষ্কার হিসেবে যে পাঁচ ডলার হাতে নিয়ে বসে আছে, তা জানাতেও ভুলল না। বিশ মিনিটের মাঝে ট্যাক্সি পৌঁছে গেল বিমান বন্দরে। পুরোটা সময় চুপ করে বসে ছিল ড্রাইভার।

কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, বিমান বন্দরের টার্মিনাল ধরে ধাক্কা খেতে খেতে এগোচ্ছে শ্যাডো। ইন্টারনেটে কেনা টিকেটটা কাজ করবে কিনা, সেটা নিয়ে একটু ধন্দে পড়ে গেল বেচারা। তার উপর শুক্রবারের টিকেট কেনা হয়েছে, আজকের না। আসলে যেকোন ইলেকট্রনিক বস্তুই শ্যাডোর কাছে যেন জাদুর আখড়া। কোন সময় যে বাতাসে মিলিয়ে যাবে, কে জানে!

তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম পেছনের পকেটে ওয়ালেটের অস্তিত্ব অনুভব করছে ও। ওতে মেয়াদোত্তীর্ণ কয়েকটা ক্রেডিট কার্ড আর জানুয়ারি পর্যন্ত মেয়াদ থাকা একটা মাত্র ভিসা কার্ড রয়েছে। তবে জিনিসটার উপস্থিতি যেন বাড়তি সাহস যোগাচ্ছে যুবককে। রিজার্ভেশন নাম্বার লেখা কাগজটাও আছে ওতে। একবার কোনক্রমে বাড়ি পৌঁছাতে পারলে হয়! লরা মনে হয় ঠিকই আছে, ওকে

কয়েকদিন আগে বের করার জন্য দুর্ঘটনার নাটক সাজিয়েছে কেবল! অবশ্য সরকার কর্মচারীদের কথা বলা যায় না, অন্য কোন লরা মুনের সাথে ওর স্ত্রীকে গুলিয়েও ফেলেতে পারে।

বিমান বন্দরের বাইরে, আকাশে থেকে থেকে দেখা যাচ্ছে বজ্রের আলো। শ্যাডো বুঝতে পারল, দম বন্ধ করে আছে ও। যেন অপেক্ষা করছে অভাবনীয় কিছুর। দূর থেকে একটা বজ্রপাতের আওয়াজ ভেসে আসতেই দম ছাড়ল সে। টের পেল, কাউন্টারের ওপাশ থেকে এক ক্লান্ত সাদা মহিলা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

'হ্যালো,' বলল শ্যাডো। গত তিন বছরে আপনিই প্রথম মহিলা যার সাথে আমার কথা হচ্ছে, মনে মনে বলল ও। 'আমার কাছে একটা ই-টিকেট নাম্বার আছে। আমার শুক্রবার বিমানে চড়ার কথা ছিল। কিন্তু আজকেই যেতে হবে, আমার এক আত্মীয়া মারা গিয়েছেন।'

'আহা!' সান্ত্বনার সুরে বলল মহিলা। কী-বোর্ডে খটাখট কী সব টাইপ করে স্ক্রিনের দিকে তাকাল। 'কোন সমস্যা নেই। সাড়ে তিনটার বিমানে আপনার যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে ঝড়ের জন্য ছাড়তে দেরি হতে পারে, দয়া করে স্ক্রিনে নজর রাখবেন। কোন মাল-পত্র আছে সাথে?'

কাঁধে ঝোলানো একমাত্র ব্যাগটা তুলে ধরল শ্যাডো। 'এটা বইতে তো কোন অসুবিধা নেই, নাকি?'

'নাহ,' জানাল মহিলা। 'আপনার সাথে ছবিওয়ালা কোন পরিচয় পত্র আছে?'

ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বের করে দেখাল শ্যাডো।

বিমান বন্দরটা আকারে খুব একটা বড় না হলেও, মানুষের সংখ্যা খুব একটা কম না। বসে বসে তাদের আনাগোনা দেখল ও। কেউ ব্যাগ নামিয়ে রাখছে, কেউ আবার ওয়ালেটটা সাবধানে ঢুকিয়ে রাখছে পেছনের পকেটে। কেউ কেউ তো একবার যে পার্স মেঝেতে নামিয়ে রাখছে, ওদিকে তারপর আর তাকাচ্ছেই না!

এতক্ষণে শ্যাডো বুঝতে পারল, জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে ও!

বিমানে ওঠার এখনও আধ ঘণ্টা বাকি আছে। এক স্লাইস পিজ্জা কিনে খেতে বসল ও, পনির যে এত গরম হবে তা বুঝতে পারেনি বলে পুড়িয়ে ফেলল জিহ্বা। পকেট হাতড়ে কয়েকটা পয়সা বের করে চলে গেল ফোন বুথের কাছে। রবিকে ব্যায়ামাগারের নাম্বারে ফোন করল ও, কিন্তু উত্তর দিল অ্যানসারিং মেশিন।

'হেই, রবি,' বলল শ্যাডো। 'শুনছি, লরা নাকি মারা গিয়েছে! আমাকে তাই আগে আগেই মুক্তি দিয়েছে জেল থেকে, বাড়ি ফিরছি।'

তারপর, ফোন করল বাড়ির নাম্বারে। এরকম ভুল মানুষই করে, ও নিজেও করতে দেখেছে অনেককে। কিন্তু লরার কণ্ঠ শুনে যেন সব ভুলে গেল।

'হাই,' বলছে মেয়েটা। 'আমি বাড়িতে নেই বা এই মুহূর্তে ধরতে পারছি না। ম্যাসেজ রেখে দিন, আমি পরে ফোন করছি। দিনটা আপনার ভালো কাটুক।'

ম্যাসেজ দিতে পারল না শ্যাডো।

ফিরে এসে গেটের কাছে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসল ও, এত জোড়ে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরল ব্যাগটাকে যে ব্যথা করতে শুরু করল হাত।

লরাকে সেই প্রথম দেখার স্মৃতিটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তখন অবশ্য ও মেয়েটার নামও জানত না। অড্রি বার্টনের বান্ধবী ছিল লরা। চিচির দোকানে রবির সাথে বসে ছিল শ্যাডো, এমন সময় অড্রির পিছু পিছু ওদের কাছে এসেছিল মেয়েটা। ওর মনে আছে, প্রথম কয়েক মুহূর্ত যেন পলক ফেলতে ভুলতে গিয়েছিল ও! লম্বা বাদামী চুল আরও প্রস্ফুটিত করে তুলেছিল লরার নীলচে চোখজোড়াকে। শ্যাডোর তো মনে হয়েছিল, মেয়েটা বুঝি রঙিলা লেন্স পরে আছে!

সে রাতে চুমো খেয়ে একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল ওরা, তখনই বুঝে গিয়েছিল শ্যাডো-কখনও আর কাউকে চুমো খাবার দরকার নেই ওর।

আমচকা ভেসে আসা একটা নারী কণ্ঠ কেড়ে নিল ওর মনোযোগ, বিমানে চড়ার সময় হয়েছে। একদম পেছনের সারির একটা সিট পেয়েছে শ্যাডো, আশেপাশে প্রায় সবগুলোই খালি। বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই, বিমানের পাশেও পানি আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও।

বিমান আকাশে ভাসলে, ঘুমিয়ে পড়ল যুবক।

অন্ধকার এক জায়গায় রয়েছে ও। শ্যাডোর চোখে চোখ রেখে যে প্রানিটা তাকিয়ে আছে, তার মাথাটা মহিষের মতো। বড়, ভেজা চোখ দুটো ভরে আছে ঘৃণা আর রাগে। দেহটা অবশ্য মানুষের, তেল চকচকে।

'আসছে পরিবর্তন,' ঠোঁট না নাড়িয়েই বলল মহিষ। 'খুব দ্রুতই কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাকে।'

মশালের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে গুহার দেয়ালে।

'আমি কোথায়?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'পৃথিবীতে, আবার পৃথিবীর অভ্যন্তরেও বলতে পারো।' মহিষ-মানব জানাল। 'বিস্মৃতিরা যেখানে অপেক্ষা করে, সেখানে আছ তুমি।' চোখগুলো যেন গলিত মার্বেলের রূপ ধারণ করেছে। কণ্ঠ গমগমে, মন হরা ভেসে আসছে ভূ-গর্ভস্থ কোন গুহা থেকে। ভেজা গরুর গন্ধ নাকে

পাচ্ছে শ্যাডো। 'বিশ্বাস করো।' গমগমে কণ্ঠে ওকে আদেশ করল ওটা। 'বিশ্বাস করো, নইলে মরবে।'

'কী বিশ্বাস করব?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'বিশ্বাস রাখব কীসে?'

এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল মহিষ-মানব। আস্তে আস্তে ওর চোখের সামনেই বাড়তে শুরু করল তার আকৃতি। চোখে আগুনে দৃষ্টি নিয়ে জবাব দিল। 'সব কিছুতে।'

নড়ে উঠল শ্যাডোর দুনিয়া, স্বপ্ন ভেঙ্গে আবার বিমানে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু না, বিমানটাও নড়ছে! সামনের সারিতে বসা এক মহিলা চিৎকার করতে করতেই আবার থেমে গেল।

বিমানকে ঘিরে নাচছে বজ্রের লকলকে জিহ্বা। ইন্টারকমে ক্যাপ্টেন জানালেন, আরেকটু উঁচুতে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। নইলে এই ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

থেকে থেকে কেঁপে উঠছে বিমান। শ্যাডো অলস ভঙ্গিতে ভাবল, এখন মারা গেলে কেমন হয়? সেই সম্ভাবনা খুব কম হলেও, একেবারে অসম্ভব না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও, এসব ভাবার চাইতে বজ্র-নৃত্য দেখা ভালো।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল যুবক, এবার স্বপ্নে দেখতে পেল-জেলে ফিরে গিয়েছে। খাবার নেবার লাইনে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে লো কী ফিসফিস করে জানাচ্ছে, কেউ একজন ওকে হত্যা করার জন্য অনেক টাকা দেবার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু কে বা কেন, তা জানার আগেই জেগে উঠল ও। এবার কিন্তু ঝড়ের কোন হদিস নেই, নিরাপদেই ল্যাণ্ড করল বিমান।

হাঁচড়েপাঁচড়ে বিমান থেকে নামল শ্যাডো।

সব বিমান বন্দরই দেখতে এক রকম, ভাবল ও। এটাও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই একই টাইলস, সেই একই হাঁটার রাস্তা। তবে সমস্যা হলো, এখানে ওর আসার কথা না। এটা অনেক বড় একটা বন্দর, অনেক বেশি মানুষের ভিড় এখানে। গেটের সংখ্যাও প্রচুর।

'ম্যাম, একটু শুনবেন?'

ক্লিপবোর্ডের উপর দিয়ে ওর দিকে তাকাল মহিলা। 'বলুন।'

'এই বিমান বন্দরের নাম কী?'

অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মহিলা, যেন ও ঠাট্টা করছে কিনা তা বুঝতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষণ পর জবাব এলো, 'সেন্ট লুইস।'

'আমার তো ধারণা ছিল, আমার বিমান ঈগল পয়েন্টে নামবে।'

'কথা তো তা-ই ছিল। তবে ঝড়ের জন্য এখানে নামতে বাধ্য হয়েছে। কেন, ক্যাপ্টেন জানাননি?'

'জানিয়েছেন হয়তো। আমি আসলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'তাহলে ওই যে...লাল কোট পরা ভদ্রলোকের সাথে কথা বলুন।'

'লাল কোট পরা ভদ্রলোক' লম্বায় শ্যাডোর প্রায় সমান। কম্পিউটারে কিছু একটা দেখেই সে শ্যাডোকে বলল দৌড়াতে! টার্মিনালের অন্য দিকের একটা গেটে যত দ্রুত সম্ভব চলে যেতে বলল ওকে।

বিমানবন্দরের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে গেল শ্যাডো, কিন্তু লাভ হলো না। ও পৌঁছাবার আগেই ওপাশের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বেচারার চোখের সামনেই আস্তে আস্তে উড়াল দিল বিমান।

যাত্রীদের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করা মহিলা (যে ছোটখাটো আর যার নাকের পাশে একটা আঁচিল আছে) আরেক মহিলার সাথে কথা বলে কোথায় যেন ফোন করল (নাহ, ওই বিমানটা আজ আর ছাড়ছে না)। কীসব দেখে নিয়ে আরেকটা বোর্ডিং কার্ড প্রিন্ট করল সে। 'এটা নিয়ে যান,' শ্যাডোকে জানান হলো। 'আমরা বলে রাখছি যে আপনি যাচ্ছেন।'

শ্যাডোর মনে হলো, ওকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আবার দৌড়ে বিমান বন্দরের অন্য প্রান্তে চলে এলো ও। অথচ এখানেই প্রথম নেমেছিল বিমান থেকে!

গেটে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্রাকৃতির এক লোক ওর হাত থেকে বোর্ডিং পাসটা নিল । 'আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম আমরা।' বলে পাস থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ ছিঁড়ে নিল সে। শ্যাডোর সিট নাম্বার ১৭ডি। তাড়াতাড়ি বিমানে চড়ে বসল ও। সে-ই শেষ যাত্রী, ও ভেতরে পা রাখা মাত্র বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা।

ফার্স্ট ক্লাসে পা রাখল শ্যাডো, মাত্র চারটি সিট এখানে। তাদের মাঝে তিনটাতেই কেউ না কেউ বসে আছে। একমাত্র ফাঁকা সীটটার পাশে বসে আছেন দাড়িওয়ালা এক ধূসর স্যুট পরা ভদ্রলোক। ওর চোখে চোখ রেখে হাসলেন তিনি, হাতে পরা ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন।

বুঝেছি তো, আমার জন্য দেরি হয়েছে–ভাবল শ্যাডো। দোয়া করি যেন এরচেয়ে বড় কোন সমস্যায় তোমাকে পড়তে না হয়।

বিমানটা যাত্রী দিয়ে ভর্তি বলেই মনে হলো। তবে পেছনে যেতে যেতে শ্যাডো বুঝতে পারল, আসলে বিমানটা পুরোপুরি ভর্তি। এমনকী ওর সীট, ১৭ডিতেও বসে আছে এক মাঝবয়সী মহিলা! মহিলাকে ওর টিকিট দেখাল শ্যাডো, মহিলাও দেখল। দুটোতেই ১৭ডি লেখা!

'স্যার, দয়া করে আপনার সিটে বসবেন?' বিমানবালা এসে অনুরোধ করল।

'দুঃখিত,' বলল শ্যাডো। 'সেটা মনে হয় সম্ভব হবে না।'

বিরক্তি প্রকাশ করে দুজনের বোর্ডিং কার্ড দেখল বিমানবালা। তারপর শ্যাডোকে সামনে নিয়ে এসে ফার্স্ট ক্লাসের একমাত্র খালি সিটে বসিয়ে দিল। 'আজ মনে হচ্ছে ভাগ্য দেবী আপনার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।' ওকে বলল মেয়েটা। 'পান করার জন্য কিছু এনে দেব? টেক-অফ করতে এখনও কিছু সময় বাকি আছে।'

'বিয়ার হলে ভালো হয়,' বলল শ্যাডো। 'আপনার কাছে যে ব্র্যাণ্ডের আছে, সেটাই নিয়ে আসুন।'

চলে গেল বিমানবালা।

শ্যাডোর পাশে বসা ধূসর স্যুট পরিহিত লোকটা নখ দিয়ে ঘড়িতে টোকা মেরে বললেন, 'দেরি করে ফেলেছ।' হাসি ফুটেছে বটে তার চেহারায়, কিন্তু তাতে কোন উষ্ণতা নেই।

কালো রোলেক্সটার দিকে একবার তাকাল শ্যাডো। তারপর বলল, 'বুঝতে পারলাম না?'

'বললাম, তুমি দেরি করে ফেলেছ।'

সেই মুহূর্তে বিমানবালা এসে শ্যাডোকে একটা বিয়ার দিয়ে গেল।

পাগল নাকি লোকটা, ভাবল ও। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, ধূসর স্যুটের লোকটা সম্ভবত ওর দেরি করে বিমানে চড়ার কথা বোঝাচ্ছেন। 'আপনাকে দেরি করিয়ে দিয়েছি বলে দুঃখিত।' ভদ্রভাবে বলল ও। 'তাড়া আছে কোন?'

উড়োজাহাজ নড়তে শুরু করলে, বিমানবালা এসে নিয়ে গেল বিয়ারের বোতল। কিন্তু পাশে বসা লোকটার দিকে সে এগোতেই বয়স্ক মানুষটা দেঁতো হাসি হেসে বললেন, 'আরে, চিন্তা করো না। আমি শক্ত করেই ধরে রাখব গ্লাস।' বিমানবালা দুর্বল কণ্ঠে আপত্তি জানাল, বিমান উড্ডয়নের সময় কারও হাতে জ্যাক ড্যানিয়েলসের গ্লাস থাকা উচিত না। কিন্তু মানলেন না ভদ্রলোক।

'সময়ের মূল্য অপরিসীম।' মেয়েটা চলে যেতে শ্যাডোকে জানালেন তিনি। 'তবে আমি সে জন্য বলিনি কথাটা। আমার ভয় হচ্ছিল, তুমি হয়তো বিমানটা ধরতেই পারবে না।'

'আপনার অনেক দয়া।'

কেঁপে উঠছে বিমানটা, উড়াল দেয়ার জন্য যেন তর সইছে না যন্ত্রটার।

'দয়া না ছাই,' ধূসর স্যুটের লোকটা বললেন। 'আমি তোমাকে একটা কাজ দিতে চাই, শ্যাডো।'

গর্জন করে উঠছে বিমানের ইঞ্জিন। ছোট বিমানটা আচমকা সামনে বাড়তেই, সিটের সাথে যেনে মিশে গেল শ্যাডো। এক মুহূর্ত পরেই আকাশে ভাসল ওরা, বন্দরের আলো অনেক নিচে থেকে ওদের দিকে চেয়ে আছে। এতক্ষণে পূর্ণ দৃষ্টিতে পাশের আসনের আরোহীর দিকে তাকাল শ্যাডো।

লোকটার চুল লালচে ধূসর; দাড়িটা থুতনি জুড়ে, তবে ধূসর-লাল। চারকোনা চেহারাটার মাঝখানে দুটো হালকা ধূসর চোখ। স্যুটটা দামী বলেই মনে হচ্ছে। ভ্যানিলা আইসক্রিম গলে গেলে যেমন দেখা যায়, অনেকটা সেই রঙের। গলার কাছে সিল্কের টাই; পিনটা রুপার, গাছের মতো দেখতে।

জ্যাক ডানিয়েলসের গ্লাসটা উঁচু করে ধরলেন তিনি। আশ্চর্য হলেও সত্য, এক ফোঁটা মদ নিচে পড়ল না!

'কেমন কাজ, জানতে চাইলে না?'

'আমাকে চেনেন কী করে?'

মুচকি হাসলেন ভদ্রলোক। 'মানুষ নিজেকে কী নামে ডাকে, সেটা জানার চাইতে দুনিয়ার আর কোন সহজ কাজ আছে নাকি? একটু চিন্তা, একটু সৌভাগ্য আর একটু স্মৃতি খাটালেই তা জানা যায়। তারচেয়ে বরং কাজের ধরন সম্পর্কে জানতে চাও।'

'না,' বলল শ্যাডো। এরইমধ্যে বিমানবালা ওকে আরেক গ্লাস বিয়ার দিয়ে গিয়েছে। সেটায় চুমুক দিল ও।

'কেন?'

'আমি বাড়ি ফিরছি। ওখানে আমার জন্য চাকরি অপেক্ষা করছে। আমার আরেকটার দরকার নেই।'

লোকটার ক্রুর হাসিটা মলিন হলো না এক বিন্দু । তবে এখন যেন কিছুটা প্রাণ এসেছে সেই হাসিতে। 'বাড়ি ফিরে তো তুমি কোন চাকরি পাবে না।' বললেন তিনি। 'আসলে বাড়িতে তোমার ফিরে যাবার কোন কারণই নেই। অথচ আমি তোমাকে একেবারে আইন সিদ্ধ একটা কাজের প্রস্তাব দিচ্ছি। টাকা পাবে, পাবে কিছুটা হলেও নিরাপত্তা, সেই সাথে বাড়তি সুবিধা তো আছেই। যদি টিকে থাকতে পারো, তাহলে যাও-পেনশন পর্যন্ত দেব তোমাকে। চলবে?'

শ্যাডো উত্তর দিল। 'আমার নাম নিশ্চয় ব্যাগে লেখা দেখেছেন?'

উত্তর দিলেন না ভদ্রলোক।

'আপনি যে-ই হন না কেন,' আবারও বলল শ্যাডো। 'আমি যে এই বিমানে উঠব তা আপনার জানার কথা না। আমি নিজেই তো জানতাম না! আর যদি সেন্ট লুইসের আমার বিমান পাল্টাতে না হতো, তাহলে থাকতামও না। আমার ধারণা, আপনি ঠাট্টা করছেন। হয়তো আমাকে কোনভাবে ধোঁকা দিতে চাইছেন! আমার আরও ধারণা, অর্থহীন এই আলোচনা এখানে থামিয়ে দিলেই আমাদের উভয়ের জন্য ভালো হবে।'

শ্রাগ করলেন লোকটা।

সামনে রাখা ম্যাগাজিনটা তুলে নিল ও, কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যাচ্ছে বিমান। মন দিতে কষ্ট হচ্ছে বেচারার। পড়ছে হয়তো, কিন্তু শব্দগুলোকে মাথায় রাখতে পারছে না।

স্যুট পড়া লোকটা সিটে আয়াসে বসে আছে, থেকে থেকে ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছে জ্যাক ড্যানিয়েলসের গ্লাস। চোখ বন্ধ।

বিমানে কোন কোন গানের চ্যানেল ধরে, সেটার তালিকা পড়ল শ্যাডো, এরপর মন দিলে বিশ্বের একটা ম্যাপে। ওটা যেন-তেন ম্যাপ না, কোথায় কোথায় এই কোম্পানির বিমান যায়, তা লাল দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। ম্যাগাজিন পড়া শেষ করে, ওটাকে পকেটে পুড়ল বেচারা।

চোখ খুললেন লোকটা। অদ্ভুত কিছু একটা আছে ওই চোখ দুটোয়, ভাবল শ্যাডো। একটার রঙ অন্যটার চাইতে একটা বেশিই ধূসর। ওর দিকে তাকালেন লোকটা। 'ভালো কথা,' বললেন তিনি। 'তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে দুঃখিত। অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল তোমার।'

আরেকটু হলেই লোকটাকে মেরে বসত শ্যাডো। কিন্তু তা না করে বড় একটা শ্বাস নিল ও। এক...দুই এভাবে পাঁচ পর্যন্ত গুনল। 'আসলেই তাই।'

মাথা নাড়লেন লোকটা। 'যদি অন্য কোন ভাবে...' বলে দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন তিনি।

'গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে ও,' বলল শ্যাডো। 'মারা যাবার এরচেয়ে বাজে অনেক উপায়ও আছে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন লোকটা। শ্যাডোর মনে হলো, যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছেন তার সঙ্গী! কী অদ্ভুত!

'শ্যাডো,' স্যুট পরা ভদ্রলোক বললেন। 'ঠাট্টা করছি না কিন্তু। ধোঁকা দেবার চেষ্টাও করছি না। অন্য যে কোন কাজের চাইতে আমার কাজে বেশি টাকা পাবে। তুমি জেলঘুঘু। নিশ্চয় তোমাকে চাকরি দেবার জন্য লাইন ধরে লোক দাঁড়িয়ে নেই!'

'মি. বাল-ছাল-যেই হোও না কেন,' রেগে গেল শ্যাডো। 'দুনিয়ার সব টাকা দিলেও তোমার হয়ে কাজ করব না।'

হাসিটা বড় হয়ে গেল। শ্যাডোর সেই হাসি দেখে শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে করা একটা টেলিভিশন শো-র কথা মনে পড়ে গেল। তাদের মতে, যখন এই প্রানিরা দাঁত খিঁচায়, তখন বুঝতে হবে যে তারা ভয় পাচ্ছে বা ঘৃণা প্রদর্শন করছে। কিন্তু যখন হাসে, তখন ধরে নিতে হবে যে হুমকি দিচ্ছে!

'আমার হয়ে কাজ করো। অবশ্য তাতে কিছুটা ঝুঁকি আছে বটে, কিন্তু বেঁচে থাকলে যা চাবে-তাই পাবে। চাইলে আমেরিকার পরবর্তী রাজাও হতে পারো।' বললেন ভদ্রলোক। 'এই প্রস্তাব আর কে দেবে তোমাকে শুনি?'

'কে আপনি?'

'আহ। তথ্য বিনিময়ের যুগে বাস করছি আমরা, তাই না? এই মেয়ে, আরেক গ্লাস জ্যাক ডানিয়েলস দাও তো।' বিমানবালা চলে যেতে আবার শ্যাডোর দিকে মন দিলেন তিনি। 'একেক সময়ে ছিল একেক যুগের রাজত্ব। কিন্তু তথ্য আর জ্ঞানের দাম ছিল সব সময়।'

'আমি জিজ্ঞাসা করেছি, কে আপনি?'

'বলছি দাঁড়াও। আজ তো আমার দিন, তাই নাহয় আমাকে ওয়েনসডে বলেই ডাকো। মি. ওয়েনসডে। ঠিক আছে?'

'এটা আপনার আসল নাম?'

'আপাতত এতেই চলবে,' উত্তর পেল শ্যাডো। 'যাই হোক, আমার প্রস্তাবটার কথা ভেবে দেখ। এখুনি উত্তর দিতে হবে না। সময় নাও, অসুবিধা নেই।' চোখ বন্ধ করে আসনে হেলান দিলেন তিনি।

'লাগবে না।' বলল শ্যাডো। 'আমার আপনাকে পছন্দ হয়নি। আপনার হয়ে কাজও করতে চাই না।'

'যা বলছিলাম,' চোখ না খুলেই বললেন ওয়েনসডে। 'সময় নিয়ে উত্তর দাও।'

মসৃণ অবতরণ যাকে বলে, সেটা জুটল না বিমানের কপালে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও; দেখতে পেল নির্জন এক বিমানবন্দরে এসে নেমেছে। ঈগল পয়েন্টে যাবার আগে আরও দুটো বন্দরে থামতে হবে। পাশে চাইল ও, মি. ওয়েনডের দিকে। ঘুমাচ্ছেন তিনি।

কেন যেন উঠে দাঁড়াল ও, ব্যাগটাকে তুলে নিয়ে পা রাখল বিমানের বাইরে। ভেজা টারম্যাক ধরে এগিয়ে গেল টার্মিনালের দিকে। এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, ফোঁটা এসে স্পর্শ করে যাচ্ছে ওর মুখমণ্ডল।

দালানে প্রবেশের আগ মুহূর্তে থেমে গেল ও, ঘুরে দাঁড়িয়ে একবার বিমানের দিকে তাকাল। নাহ, আর কেউ নামেনি। ওর চোখের সামনেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল ওটার, উড়ালও দিল কিছুক্ষণ পরেই। ভেতরে প্রবেশ করে গাড়ি ভাড়া নিল শ্যাডো। পার্কিং-লটে গিয়ে আবিষ্কার করল, ওটা আসলে একটা ছোট্ট লাল টয়োটা!

রেন্ট-আ-কার থেকে পাওয়া ম্যাপটা খুলল সে, প্যাসেঞ্জার'স সিটে ওটাকে রেখে যাত্রাপথ দেখে নিল। ঈগল পয়েন্ট এখনও আড়াইশ মাইল দূরে!

এত দূর ঝড় আসেনি বলেই মনে হচ্ছে। আর আসলেও, তাণ্ডব চালিয়ে বিদায় নিয়েছে। আবহাওয়া ঠান্ডা, দিনটাও পরিষ্কার। চাদের সামনে ভিড় জমিয়েছে মেঘ।

প্রায় দেড় ঘণ্টা একটানা গাড়ি চালাল শ্যাডো, উত্তর দিকে।

রাত হয়েছে, ক্ষুধাও পেয়েছে শ্যাডোর। হাইওয়ে থেকে নেমে নট্টামুন (জনসংখ্যা ১৩০১) শহরে ঢুকল ও। অ্যামোকো কোম্পানির একটা স্টেশনে তেল ভরে নিয়ে ক্যাশে বসা মহিলার কাছে জানতে চাইল, আশেপাশে খাবারের দোকান-টোকান আছে কিনা।

'জ্যাকের ক্রোকোডাইল বারে দেখতে পারো।' ওকে জানাল বিরক্তিতে প্রায় জমে যেতে বসা মহিলা। 'কাঁচা রাস্তা ধরে পশ্চিমে একটু এগোলেই হবে।'

'ক্রোকোডাইল বার?'

'হুম। জ্যাকের মতে, এই নামে নাকি ওর বারের 'ব্যক্তিত্ব' বোঝা যায়!' এক টুকরা কাগজ বের করে কোন পথে যেতে হবে তা এঁকে দেখাল মহিলা। জানাল, ওখানকার চিকেন রোস্ট খেলে, এক বাচ্চা মেয়ের কিডনি চিকিৎসার ফাণ্ডে টাকা জমা হবে। 'কয়েকটা কুমির, একটা সাপ আর একটা ওই বড়...সাপের মতো প্রানিটা আছে জ্যাকের ওখানে।'

'ইগুয়ানা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটাই।'

শহর, একটা সেতু আর প্রায় দুই মাইল পার হবার পর বারটাকে খুঁজে পেল শ্যাডো। পার্কিং-লট প্রায় ফাঁকা।

তবে ভেতরটা একেবারে নির্জন নয়। বারে পা রাখা মাত্র ভারী একটা বাতাস যেন চেপে বসল শ্যাডোর ওপর। জুকবক্সে 'ওয়াকিং আফটার মিডনাইট' গানটা বাজছে। চারপাশে তাকিয়েও কোন কুমিরের দেখা পেল না ও। একবার ভাবল, স্টেশনের মহিলা ওর সাথে ঠাট্টা করেনি তো!

'কী নেবে?' জানতে চাইল বারটেণ্ডার।

'বিয়ার আর হ্যামবার্গার। সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।'

'শুরুতে চিলি দেব? এই স্টেটে এমন ভালো চিলি আর পাবে না।'

'চলবে।' বলল শ্যাডো। 'আপনাদের এখানে হাত-মুখ ধোবার জায়গাটা কই?'

বারের এক কোনার দিকে ইঙ্গিত করল বারটেণ্ডার। ওদিকে তাকাতেই একটা দরজা দেখতে পেল শ্যাডো। স্টাফ করা একটা অ্যালিগেটরের মাথা দরজার উপরে ঝুলছে। ওদিকে এগোল সে।

ঘরটা তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার, আলোও আছে বেশ। প্রথমেই ঘরটার সব কিছু দেখে নিল শ্যাডো, অভ্যাস। ('মনে রেখ শ্যাডো', লো কী'র ফিসফিসিয়ে বলা কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'জলত্যাগের সময় চাইলেও তুমি আত্মরক্ষা করতে পারবে না।') একেবারে বায়ের ইউরিনালটা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিল ও। জিপ খুলে কতক্ষণ ধরে যে প্রস্রাব করল, তা নিজেও বলতে পারল না। চোখের সামনে লাগিয়ে রাখা জ্যাক আর দুই অ্যালিগেটরের ছবিটা মন দিয়ে দেখে নিল।

ডান দিকের ইউরিনাল থেকে মৃদু কাশির আওয়াজ ভেসে এলো, অথচ ওর পরে আর কাউকে ঢুকতে দেখেনি শ্যাডো!

ধূসর স্যুট পরা লোকটাকে বসে থাকা অবস্থায় এতটা লম্বা মনে হয়নি! অথচ প্রায় শ্যাডোর সমান লম্বা তিনি, আর শ্যাডোকে কেউ বিশালদেহি না বলে পারবে না। প্রস্রাব করা শেষ করে জিপার লাগিয়ে নিলেন মি. ওয়েনসডে। হাসলেন তিনি, শেয়াল-মার্কা হাসি। 'সময় তো অনেক পেলে শ্যাডো। কি ঠিক করলে, নিচ্ছ কাজটা?'